নাটক

শেষ বর্ষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা, পরিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ

রাজা। ওহে থামে তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভালো বুঝতে পারিনে। কী লিখছে ? "শেষবর্ষণ"।

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায় ?

নটরাজ। কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন ?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ সুর তান লয়, কিচুই বোঝা যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিতু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন ?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালান নি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘ রঙ ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বুঝি সেই মেঘ ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রঙ খুলতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে ? আমাকে বোঝবে কে ?

নটরাজ। সে ভার আমার উপর। ইশারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা। আমার কাছে ইশারা চলবে না। বিদ্যুতের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে ?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা। বর্ষাকে আহ্বান ? এই আশ্বিন মাসে ?

রাজকবি। ঋতু-উৎসবের শবসাধনা ? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন। অদ্ভুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎ-কে চেনা যায় না। আগে আবরণ তার পরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি) মানে কী হে ?

পরিষদ। মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজকবি। যেন দৌপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরও বাড়তে থাকে।

নটরাজ। বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা। রসো রেসো। বর্ষাকে ডাকা কী রকম ? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে

নটরাজ। সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরে আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা। গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরই বাঁধা ?

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। এই আর এক বিপদ।

রাজকবি। নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্বদলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে "শেষ বর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ। রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উলটে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা না পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশকিল।

নটরাজ। মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন ? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পরিষদ। অলমতিবিস্তরেণ। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ । (গায়কগায়িকাদের প্রতি) ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো--

এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এস করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়বীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী,
অধরের নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘন বরিষনে জল-কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন,'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে ? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল কারো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশান্ত ধারায় একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ওই শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে।

রাজা। পুব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে ?

নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি শ্রাবণের পূর্ণিমা ! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইশারায়।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায় ? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমরা জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালবদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন স্বপনলোকে।

মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর ? সেও তো অসম্পূর্ণ ?

রাজা। ওই দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি ?

নটরাজ। মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা।
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
মরমর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে।
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা।

রাজা। সব রকমের খ্যাপামিই তো হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী ?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে- থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে--

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,

ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়াল, ঘটবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তব ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজকবি।তাই না হয় হল কিন্তু অশ্রুবাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না।

নটরাজ। মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য একবার শুনিয়ে দাও তো।

ধরণী গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

রাজা। আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগল। থামলে চলবে না। দেখো না, তোমাদের মাদলওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। বলি ও ওস্তাদ, ওই যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল, ওরা যে খ্যাপার মতো চলেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক-না সুরে কথায় মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে।

মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে ;
সর্বনাশের করিস সাধন ব্রজ-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

রাজকবি। ওই রে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরি নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাথীহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো ; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে।
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজ এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে।

রাজা। কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য, তবে ওইটে শুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,

কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী
কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পারো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া,
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে।
এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

রাজা। বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠল। ওই যে 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী।
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল
নইলে যেত কি।
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,

উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতার আড়াল থেকে
খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ। তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।

রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না? আমি যদি বলি যেতে দেব না?

নটরাজ। তাহলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য। নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শুরু হয় আকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগলমিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে।
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথীহীন'।
পুব হাওয়া কয়, ''কালোর এবার যাওয়াই ভালো'',
শরৎ বলে, ''মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে''।

নটরাজ। শরতের প্রথম প্রত্যুষে ওই যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসুর কর না।

নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না-হয় হল নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরনা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ। এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইল না। গীতাচার্য গান ধরো।

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে

আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়--
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়
আয় আয় আয়।

নটরাজ। ওই দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁচেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ওই শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্যে, তার ব্যথা কজন বোঝে ? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি।
বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে ?
নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়া হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ যে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন।
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন।
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়নটে

মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক-- আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এস শরতের অমল মহিমা,
এস হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে।
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন ; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।
নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না ; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেখালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জল ছায়াছবি সৃজনে,
এস সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না।।
ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি বাজায়ে,

সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে ?
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি,'
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।

নটরাজ। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী ব'লো
গোপন অশ্রুজলে মিলুক শরম-হাসি--
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহমিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো। [অবগুণ্ঠন মোচন]

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী ? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে ?
তোমার না জানি নে সুর জানি।
তুমি শরৎপ্রাতের আলোর বাণী।
সারাবেলা শিউলিবনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি।
আমি যা বলিতে চাই হল বলা,
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা

আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে ? বলো তো এবার কে আসবে ?

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে ?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা । নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ?

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গ-মর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে
এলে নাহিয়া।
ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
মিলনছলে বিরহ আন।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধারপানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,

ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে।
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ সাথে।

রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি ? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল ! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা--তার পরে ?

নটরাজ। 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তার পরে ? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায় ?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাসনে ফিরে দে তারে বিদায়।
সে যে দেখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশিরফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়।
কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজনবায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

রাজা। উত্তম হয়েছে।
রাজকবি।আরও অনেক উত্তম হতে পারত।